তণ কবিদের অভিভাবক

প্রভাতকুমার দাস

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ঃ তণ কবিদের অভিভাবক

‘প্রগতি’-র সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসু টের পেয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে একটি অংশ আছে প্রচারকের, সাহিত্যে যা তাঁকে অ
ানন্দ দেয় তাতে অন্যরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ নিয়ে তিনি সর্বস্ব পণ করে সাহিত্যেক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে শু
করেছিলেন। নিছক নিজেকে প্রকাশ কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সহজ করার প্রচেষ্টায় প্রলুব্ধ হন নি; সমকালীন প্রতিভাবান যঁ
ারা, তাঁদের প্রত্যেককেই সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চে সমসম্মানে অধিষ্ঠিত দেখার আগ্রহে যৌবনের শু থেকেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে
যুদ্ধ করছেন তিনি। ‘প্রগতি’র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে একজন মাত্র সে সময়ে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তিনি
নজল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তণদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়। এই দুজনকে বাদ দিলে আর সকলেই
ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপত্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভাঙেনি। সম্প
াদক দুজনকে বাদ দিলে, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে-ই ‘প্রগতি’র আয়ুষ্কাল, তাতে তাঁর স্মরণীয় কাজ জীবনানন্দর কবিত
ার পৃষ্ঠপোষকতা। জীবনানন্দ - বিরোধিতাকে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন, তাঁর বিষয়ে বিদ্ধতার
প্রতিবাদ করা বিশেষভাবে তাঁর কর্তব্য মনে হয়েছিল। ‘প্রগতি’র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দ-র প্রসঙ্গ, সমস
াময়িক অন্যদের তুলনায় বেশি পৌনঃপুনিক, যার অনেকটা অংশই প্রতিবাদ।

‘প্রগতি’র সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনের প্রসঙ্গে ‘মাসিকী’ বিভাগে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন ‘পত্রিকার সম্পাদনার কাজ যাঁরা
গ্রহণ করেন তাঁদের হাতে একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্যের ভার থাকে -- সে হচ্ছে অজ্ঞাত প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য -
সমাজে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সত্যিকারের প্রতিভা কারও পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু অ
াত্মবিস্তৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেলে তা শুকিয়ে যেতে পারে।’ ক্ষীণায়ু ‘প্রগতি’র সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্বের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব জ
ানিয়েছিলেন ‘প্রগতির প্রতি সংখ্যায় কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ -- ‘কল্লোলে’ যে - জিনিসটি
কখনো স্থান পায়নি, বা উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পায়নি। এই বিভাগের জন্য অন্যদের লেখা দুষ্প্রাপ্য, আমিই লিখি মাঝে ম
াঝে প্রায় পুরোটা -- অনিচ্ছায় নয়, বরং সাগ্রহে ও উত্তেজিতভাবে। সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা
তীব্র ও প্রকাশের জন্য উৎসুক এদিকে সেই সময়টাও ছিলো বিশেষভাবে তর্কমুখর। অলিতে - গলিতে রব তুলছে আম
াদের নিন্দুকেরা, দু - একটা সুশ্রাব্য কথাও আমাদের কানে আসছে মাঝে - মাঝে। ব্যাপারটা আমার মন্দ লাগছে না, অ
ামার ছেলেমানুষী অহমিকায় ঈষৎ শুড়সুড়ি দিচ্ছে এই ভাবনাটা যে আমরা এতদূর মনোযোগের যোগ্য। আমি দুই হাতে
ছড়িয়ে যাচ্ছি পাল্টা জবাব - শুধু শত্রুপক্ষের প্রতিবাদ হিসেবেই নয়, আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে বলেও। আমার
প্রিয় লেখকদেরপ্রশংসায় আমি নিষ্ঠুর; এক পা এগিয়ে দু-পা পেছিয়ে ইতি উতি তাকিয়ে পথ চলাও আমাদের স্বভাবে
নেই। আমার সে-সব লেখায় দাপাদাপি একটু বেশি ছিলো, গদ্য ছিল ইংরেজি বুকনি - মেশানো, নড়বড়ে কিন্তু কাঁচা
লেখাও কখনো কোনো কাজে লাগে না তা নয়, কোনো বিশেষ মুহূর্তে মুহূর্তের কথাও সবীজ হ’তে পারে, খুব উঁচু ক’রে
নতুনের নিশান উড়িয়ে দেবারও প্রয়োজন ঘটে কখনো। ‘প্রগতি’র জন্য একটু অন্তত দাবি করা যায় যে সেই দূর সময়ে,

যখন 'গণ্ডার - কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির, অন্য কোথাও সমর্থনসূচক প্রয়াস ছিলো না, সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ -- প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচচার ঘোষণায়। জীবনানন্দ স্বয়ং এই পত্রিকার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রভাকর সেন নামে এক স্নেহাথী যুবক - কবিকে জানিয়েছিলেন "বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতো আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথায় নয়; স্পষ্টতাসম্ভব তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখাবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম --- বুদ্ধদেব বসুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে।"

কলকাতা থেকে দূরে, একদল ছাত্র সাহিত্য যশপ্রার্থী তণদের উৎসাহ আর উদ্দীপনায়, ঢাকা শহর উন্মুখর হয়ে উঠেছিল, যার কেন্দ্রভূমি 'প্রগতি'র কার্যালয় বুদ্ধদেবের তদানীন্তন বাসস্থান ৪৭ নম্বর পুরানা পল্টন -- যেখানে অতি বিখ্যাত নজল ইসলামেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। কলকাতার সাহিত্যমহলের প্রতিনিধিত্ব নিযে কখনো বা অচিন্ত্যকুমারের মতো মানুষ হা জির হয়েছেন অকস্মাৎ, 'প্রগতি সমিতি'র আমন্ত্রণে। 'কল্লোলে'রই একটি টুকরো হিসাবে 'প্রগতি'-র সেই আসর দু-আড় াই বছর ধরে জমজমাট থেকেছে। পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও কেবল আর্থিক অনটনের কারণেই 'প্রগতি' 'স্থগিত হয়ে যায়, এবং এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য, মাত্র মাস তিনেকের ব্যবধানে, 'তার পূর্ণতার সময়ে' 'কল্লোল'-ও বন্ধ হয়ে য ায়।

।।দুই ।।

বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ১৯৩১ এর এক ভাদ্রের দিনে। ছাত্র হিসেবে কিংবদন্তী তুল্য বুদ্ধদেব, আই সি এস পরীক্ষা দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন পরিত্যাগ করেছিলেন পারিবারিক প্ররোচনা সত্ত্বেও, কিংবা অক্সফোর্ড যাত্রার বিষয়ে উচচাকাঙক্ষী থাকেন নি--- পেশাদারি সাহিত্যিক জীবনের সংকট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে নিজের ভাগ্যকে সমর্পণ করেকলকাতায় এসেছিলেন। তাছাড়া বিবিদ্যালয় জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চা অশ্লীলতার কুখ্যাতিতে এমনকি নিন্দিত যে কলকাতার কোনো কলেজে শিক্ষকতার 'সব দরজা বন্ধ', সে ক্ষেত্রে তাঁর ঢাকার ডিগ্রিটিও প্রধান অন্তরায় হয়েছিল। শেষপর্যন্ত তিনবারের মরিয়া চেষ্টায় ১৯৩৪ সালে রিপন কলেজে একটা চাকরি পান বুদ্ধদেব। কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগে, আবার একটি পত্রিকা প্রকাশে মনোযোগী হলেন, এবারের উদ্যোগের অভিনবত্ব পত্রিকাটি হবে শুধু কবিতার জন্য। 'পরিচয়' বা 'পূর্বাশা' পত্রিকার তণ সম্পাদকরা অন্যান্য রচনার পাশাপাশি কবিতাকে একটু পৃথক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, তখনও পর্যন্ত বাজার চলতি পত্রিকা কবিতার জন্য নির্দিষ্ট ও অভিনিবেশযে াগ্য স্থান দিতে অভ্যস্ত হয়নি। বছর চারেক আগে 'পরিচয়'-এর কোনো বৈঠকে অন্নদাশঙ্করের হাতে 'পোইট্রি' শিরোনামে ক্ষীণাঙ্গ একটি ইংরেজি পত্রিকা দেখে বাংলা ভাষায় কবিতাসর্বস্ব একটি অভিনব পত্রিকা বিষয়ে তাঁর মনের মধ্যে একটা উশকানি জেগেছিল। সেই ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটল কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুর পাঁচ টাকা করে চাঁদার দাক্ষিণ্যে -- ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-এ(অক্টোবর ১৯৩৫) প্রকাশিত হল ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকা। 'প্রগতি'র মতো এবারেও তাঁর সঙ্গে স ম্পাদক হিসাবে ঘোষিত হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সমর সেন। বুদ্ধদেব - প্রেমেন্দ্র স্বাক্ষরিত 'বিচিত্রা'য় (কার্তিক ১৩৪২) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তাঁরা জানিয়েছিলেন 'চলতি সাময়িকপত্রে নিজেদের কবিতা ছ াপতে দিতে আজকালকার অনেক কবিই অনিচ্ছুক এবং এ - অনিচ্ছা অন্যয়ও নয়। কেননা অমনিবাস মাসিকপত্রের পঁ াচমিশেলি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতারও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারা হয়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িকপত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই। অথচ আধুনিককবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন -- বাইরের পাঠকমণ্ডলী, সবসময় নিজেদের মধ্যেও সেগুলো দেখাশোনার সুবিধা হয়না।

'প্রথম সংখ্যাটি বিনামূল্যে 'পূর্বাশা প্রেস' থেকে ছেপে দিয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত। শেষোক্ত ব্যক্তিকে পূর্বে াক্ত বিজ্ঞাপনে ম্যানেজার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এক আশ্বিনের দিনে, ভবানীপুরের গলির মধ্যে একতলার একটি ঘরে, হলুদ মলাটে চল্লিশ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনহীন যে পত্রিকাটির জন্ম হল, পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বছর পরমায়ু নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতা নামে বস্তুটিকে একটা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজে তা অবিরল সংগ্রাম করে গেছে।। 'কবিতা'র

'অর্থবল' না থাকলেও, কেবল 'বন্ধুবহল' আর সম্পাদকদের 'পূর্ববঙ্গীয় গোঁয়ার্তুমি' সম্বল করেই একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জিৎ হয়েছিল ধনের শক্তির পরিবর্তে মনের শক্তির জোরেই এই জয় সম্ভব করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পত্রিকার বিদ্ধে একক আন্দোলনের মাধ্যমে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' 'পাঁচমিশেলি গুদোমঘর থেকে কবিতার অস্তিত্বকে উদ্ধার করে' 'পদপ্রাপ্তি অবমাননা' থেকে বাঁচিয়ে একটি উঁচু মানে প্রতিষ্ঠাদিয়েছিলেন তিনি। পাঠক সমাজের সচেতন আগ্রহ গড়ে তোলার কাজে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত সাময়িকপত্রের ধারায় সম্পূর্ণতুলনারহিত উদাহরণ হয়ে আছে। এক অর্থে 'কবিতা' পত্রিকার পঁচিশ বছর ব্যাপী কার্যকাল বাংলা ভাষায় রচিত আধুনিক কবিতার বিকাশ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে এক কালজয়ী ভূমিকা পালন করেছিল।

তিরিশের দশকের কবিতার বিদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ চুতর্দিকে দানা বেঁধেছিল সেটি হল দুর্বোধ্যতা। প্রথম সংখ্যা 'কবিত া' পত্রিকায় বুদ্ধদেব 'কবিতার দুর্বোধ্যতা' শিরোনামে একটি অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় রচনা করে লিখেছিলেন ''ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না, 'বোঝানো' যাবে না। যে-কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায় তার উচচতম রূপ আঠারো শতকের ইংরেজি কবিতা তাতে আর সবই আছে কবিতা নেই। যে - কবিতা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্তই বোঝা গেলো, সে কবিতা লংফেলো মিসেস হেমান্সদের, ইস্কুলের পাঠ্যকেতাব তার পরম গৌরবময় কবর। যা বোঝার জিনিস, বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ফুরিয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-অতীত বুদ্ধি-পলাতক যে-বিরাট উদ্ধৃত্ত, যে জ্বলন্ত ভাবমণ্ডল--- যেখানে অপরূপ ধবনির আর অলৌকিক ইঙ্গিতেরসীমাহীনতা-- কবিতা তো তা-ই, তা ছ াড়া আর কী? সেটি 'বোঝা' যায় না, 'বোঝানো' যায় না; যে নিজে না দ্যাখে, চোখে আঙুল দিয়েদেখানো যায় না ত াকে।'' আলোচ্য সম্পাদকীয়তে তিনি তাঁর আর একটি বিশ্বাসের কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন 'কবিতা লিখতে হ'লে যেমন বিশেষ একটি ক্ষমতা নিয়ে জন্মাতে হয়। বিশুদ্ধ কবিতা উপভোগ করতে হলেও তেমনি একটি জন্মগত ক্ষমতার প্রয়ে াজন। অধিকাংশ পাঠকই চায় যে কবিতা হবে স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ একটি বিষয়ে আবদ্ধ, যা ধরাছোয়া যায় যা বোঝা য ায়--- যেমন ক'রে ও মনের যে বৃত্তির সাহায্যে আমরা বুঝি গণিত কি দার্শনিক প্রবন্ধ -- অবিশ্যি তার সঙ্গে থাকবে ছন্দের সুখদ ঝঙ্কার।' প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (আষাঢ ১৩৪৩) এই বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় এবং সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করে 'কবিতার পাঠক' শিরোনামিত সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন 'পৃথিবীতে ভালো কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ পর্যন্ত, অন্তত কবিতার ইতিহাস এই রকমই সাক্ষ্য দেয়। একটা কথা আছে, কবি হয়ে জন্মাতে হয়; কবিতার পাঠক হয়েও জন্মাতেই হয় হয়তো। এটা মনের একটা বিশেষ বৃত্তি; যার থাকে না তার থাকে না। যেমন অনেকে বর্ণান্ধ হয়ে জন্মায়, তেমনি অনেকে জন্মায় কবিতাবধির হয়ে -- দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ঢের বেশি। কবি বারবার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন, তাই খানিকটা কল্পনাশক্তি থাকতেই হবে পাঠকের। তারপর শিক্ষা, চর্চা ও সংস্কৃতির ফলে উপভোগের ক্ষমতা ক্রমশই ব্যাপক ও গভীর করে তোলা যায় একথা বলাই বাহুল্য।' বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন, কবিতার দুর্বোধ্যতার অপবাদ ঘোচাতে হলে, পাঠকের সামনে নিত্যনতুন উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে, ক্রমাগতআলাপ আলোচনার মাধ্যমে কবি ও পাঠকের মধ্যে একটা অসংকোচ সংযোগের সেতু নির্মাণ করতে হবে, 'কবিত া' পত্রিকার স্বল্প পরিসর সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমান সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপসংহারে তিনি কিছুটা জোরের সঙ্গে জানিয়েছিলেন 'কবি তৈরি করা যায় না, কিন্তু অনুকূল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠক তৈরী হতে পারে, ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প, কিন্তু বাড়ানো যেতে পারে এবং ভালো পাঠক যত বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।'

আর্বিভাব মুহূর্তেই 'কবিতা' সকলের মন জয় করে নিতে পেরেছিল নিছক কোনো বহিরঙ্গ আয়োজনের আড়ম্বরে নয়, সর্ব াত্মক গুণগত সাফল্যই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করে যথার্থই লিখেছিলেন ''কবিতার প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলায় আধুনিক কাব্য ইতিহাসে এমন একটি সাক্ষর রেখে গেছে যা কোনো দিন মুছবে না। আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী বস্তু নয়, সে - কথা এই চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালী পাঠকবর্গ অনুভব করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করেন এমন সব কবিকে, ভবিষ্যতে যাঁরা কবিতার নানা দিক বিজয় করেছেন। যেমন জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ইত্যা দি। এঁদের কবিতা আগে নানা পত্রিকার বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁর পান নি। তাঁদের

কবিতা নিয়ে ভালো করে আলোচনাও হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকাই প্রথম তাঁদের কবি - সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে নিষ্ঠাভরে আলোচনা করে। 'কবিতা'র প্রথম বছরে যে - সব বিখ্যাত কবিতা ছাপা হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য অজিত দত্তের 'সংহত করো, সংহত করো অরি। যৌবন - বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর', জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', সমর সেনের 'আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ/ আকাশ কি সব মনে রাখে।' বুদ্ধদেব বসুর 'চিল্কার সকাল', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' । প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত 'ছুটি' কবিতাটি পড়ে জীবনানন্দ, 'কবিতা'র সম্পাদক বুদ্ধদেবকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন 'বুড়ো বয়সের রচনা dotage অনেকক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনার যৌবন চিরকাল...অগাধ স্রোতে চলেছে দেখলে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে থাকতে হয়; তাঁর ছুটি কবিতার লাইন গুলো বিশেষভাবে মনকে মোহাবিষ্ট করে তোলে; আগাগোড়া সমস্ত কবিতাটিই superb।'

আপাতদৃষ্টিতে প্রথম সংখ্যা 'কবিতা'র অনাড়ম্বর আয়োজন দেখে তার অভিনবত্ব আঁচ করা মুশকিল হয়েছিল, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে, যে জন্য কবিগুর কাছে সংখ্যাটি পাঠাতে ঈষৎ ভীত ও বিব্রতবোধ করেছিলেন বুদ্ধদেব। ভয়ের কারণ এজন্য নয় যে তাঁদের সেই 'ক্ষুদ্র উপচার' কবি অপছন্দ করবেন ---কেননা এ বিষয়ে তিনি মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত দিলেন -- কিন্তু আশঙ্কা এই জন্যে যে যদি বা, তাঁর অসামান্য সৌজন্য ও কর্তব্যবোধের তাগিদে, তিনি লিখে পাঠান কোনো দায়সারা গোছের সার্টিফিকেট, অথবা তাঁর 'ঝুলি' হাতড়ে বেড় করে দেন দু-চার লাইনের কোনো পদবিন্যাস --- যেমন দেখা যেত সেকালের অনেক মাসিক পত্রে ও কবিতার বইয়ের বিজ্ঞাপনে।' আশ্চর্যের ব্যাপার বুদ্ধদেবের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত করে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ সানন্দ ও সপ্রশংস অভিনন্দন জানালেন, 'নিরতিশয় ক্লান্ত শরীরে'ও তুলোট কাগজের এপিঠ - ওপিঠ ভর্তি অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষরে দ্রুত তাঁর জবাব লিখে পাঠালেন। প্রায় প্রত্যেকটি রচনা বিষয়ে পৃথক পৃথক মন্তব্য, যা সংক্ষিপ্ত কিন্তু মতামত হিসাবে মর্মগ্রাহী, জানালেন 'এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য বারোয়ারীর দল বাধা লেখার মত হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নতুন পরিচয় স্থাপন করেছে।' 'কবিতা' পত্রিকার পক্ষে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে আধুনিক কবিতারই জয়ধ্বনি ঘোষিত হল গুদেবের এই মন্তব্যে।

প্রথম সংখ্যা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পড়ে অাশ্বস্ত হয়ে বুদ্ধদেব তাঁর কাছেও কবিতা প্রার্থনা করলেন, তিনিও সে আমন্ত্রণে সাড়া দিতে কোনো রকম দ্বিধা না করে 'ছুটি' নামের একটি কবিতা পাঠালেন। এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ জীবিতাবস্থায় ছিন্ন হয়নি, বরং তাঁর মৃত্যুর পরেই রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠেছেন প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। 'কবিতা' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ও সমকালীন প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন 'তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে।' পরবর্তীকালে, 'কবিতাভবন' - এস্মারকচিহ্নটি রচনার সময় বুদ্ধদেব নিশ্চয় কবিগু অভিহিত 'খেয়ার নৌকো' অভিধাটি স্মরণ রেখেছিলেন, কেননা উত্তাল অথৈ সমুদ্রে ভাসমান নৌকার প্রতীক ছাড়া অবিরল বিরোধের বিদ্ধে 'কবিতা' পত্রিকার সংগ্রাম আর কিভাবে চিহ্নিত করা যেত! প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সাত বছর পরে উদ্ভাবিত এই চিহ্নটির নিয়মিত ব্যবহার নতুনকালের কবি ও কাব্যপাঠকের কাছে শ্রদ্ধামিশ্রিত দিকনির্ণায়ক স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে দীর্ঘকাল।

প্রথম সংখ্যা পাঠ করে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৮২ অগ্রহায়ন) দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে লিখেছিলেন 'এতে এমন কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে, যার মূল্য, আমার মতে আজকালকার যে কোনো তণ ইংরেজ কবির রচনা অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। কাব্যরসিকের পক্ষে এই যথেষ্ট।' এবং আর একটি সমালোচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেটি ১৯৩৬-এর ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'টাইম' পত্রিকার সাহিত্য ত্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অস্বাক্ষরিত সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির লেখক সে সময়কার একমাত্র শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন, সেই এডওয়ার্ড টমসন সমালোচনার শেষে আশা পোষণ করেছিলেন 'এই কবিরা এমন - একটি আন্দোলনের প্রতিভূ, বাংলার চিন্তাকে যা নতুন রূপ দেবে, আর বাংলার ভিতর দিয়ে সর্বভারতীয় চিন্তাকে।'

প্রথম দশ বছরে যাঁরা অপর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ,

অমিয় চক্রবর্তী এবং অবশ্যই স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু, মৌলিক কিংবা অনুবাদ কবিতা ছাড়া প্রবন্ধসমালোচনায় সমকালীন প্রতিভাবানদের গুণকীর্তনে তিনি সর্বদা মুখর থেকেছেন 'কবিতা'র পাতায়। তারপরেই উল্লেখ করতে হয় জীবনানন্দর, 'প্রগতি' আর 'কবিতা' পত্রিকাই যাঁর সাহিত্যিক বিকাশের সবচেয়ে বড়ো সোপান হয়ে উঠেছিল। প্রায় সমসাময়িক, কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী কবি সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তাঁদের স্ফুরণের প্রধান বাহন হিসাবে 'কবিতা'র অগাধ আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন 'কবিতা' পত্রিকায়। অকাল প্রয়াত সুকান্ত ভট্টাচার্যর মধ্যেও বুদ্ধদেব বিশেষ প্রতিশ্রুতির স্পন্দন দেখেছিলেন। এইসব নামকরাদের পাশাপাশি এমন দু - একজন কবি 'কবিতা'র আসরে আর্বির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা 'একটি - দুটি ফুলকি তুলেই মিলিয়ে গিয়েছিলেন' -- স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তাঁদের কথা স্মরণ করেছিলেন সম্পাদক, এবং 'স্বল্পভাষী মলিনবসন একটি স্কুল' শিক্ষক সুরেশচন্দ্র সরকার, 'ঝাঁকড়া চুলের সুন্দর চেহারা' মুকুল ভট্টাচার্য (ঘোষাল) কিংবা সুস্মিতা সরকার 'ছদ্মনামে আচ্ছাদিত' এক অচেনা যুবকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি আশা পোষণ করেছিলেন এইসব হারানো ছড়ানো কবিতা নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করবেন, কিন্তু তাঁর আরো অনেক কল্পনার মতো এই ইচ্ছাটিও চিরকাল শূন্যে ঝুলে থেকেছে।

লেখক - প্রকাশক সংস্থা সংগঠিত করে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই বুদ্ধদেব তাঁর রমেশ মিত্র রোডের ক্ষণস্থায়ী বাসস্থানে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কাছে উৎসাহী হয়েছিলেন --- 'গ্রন্থকার - মণ্ডলী' নামে সেই সংগঠন দীর্ঘ আয়ু লাভ করেনি। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সের স্বপ্ন চৌত্রিশ বছর বয়সে নতুন করে সার্থক হয়ে উঠল 'কবিতাভবনে'র উদ্যোগে প্রকাশিত প্রতিটি চার আনা মূল্যের ষোলো পাতার পুস্তিকা 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার মুদ্রণে। একদিকে আধুনিক বাংলা কবিতা আর একদিকে তার সীমিত সংখ্যক পাঠক, তখনো পর্যন্ত 'কবিতা সাধারণ পাঠকের সবচেয়ে অনাদৃত এ কুখ্যাতি প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে' --- 'কবিতা'র সম্পাদক নিরন্তর অভিনব প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন কবি ও সাধারণ পাঠককে আরো ঘনিষ্ঠ বিন্দুতে মেলাতে চাইলেন।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, 'কবিতাভবন' প্রকাশনার ছত্রতলে 'নবীন - প্রবীণ, বামপন্থী - দক্ষিণপন্থী নানা কবিরা সমবেত' হয়েছিলেন, নিছক কোনো ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা মাথায় নিয়ে বুদ্ধদেব সে কাজে ব্রতী হননি, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল --- সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতারঅগ্রগতিকে সকলের সামনে তুলে ধরা। বাংলা কবিতা বিষয়ে সামান্যতম অবজ্ঞা, কিংবা উপেক্ষায় অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছেন, এমনকি সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও যদি প্রতিপক্ষ হন, তাঁকেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনেও জীবনানন্দ-র কবিতা গ্রহণে অবজ্ঞা কিংবা বিষ্ণু দে ও সমর সেন এর অনুপস্থিতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন 'কবিতা'-য় (আশ্বিন ১৩৪৫)।

'কবিতা' প্রথম দিকে, অর্থাৎ প্রথম পাঁচ বছরে যে রকম কবিতাপ্রধান হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। 'কবিতা'য় প্রধান হয়ে উঠছে গদ্য আলোচনা। এমনও হয়েছে, কোনো রকমে প্রকাশযোগ্য কবিতা নিয়ে মূল বিভাগটি সাজানো হয়েছে। বুদ্ধদেব, নিজেও এই নিস্তাপ অবস্থার কথা উল্লেখ করে চিন্তিত হয়েছেন কম নয়, যদিও সমসাময়িক মাসিকপত্রে কবিতা তখন শুধুমাত্র পাদপূরণের জন্য আর ব্যবহৃত হয় না, 'কবিতা'-র অনুকরণে তাঁরাও কবিতা ছাপার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সতর্ক হয়ে উঠেছেন। 'কবিতা'-র আবির্ভাবকালীন মৌল লক্ষ্য ছিল প্রধানত সমসাময়িক কবিদের কাব্যকলার নিত্যনতুন নিরীক্ষাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। শেষপর্যন্ত অবশ্য কবিরাই সম্পাদককে হতাশ করেছিলেন, যার জন্য একথাও বুদ্ধদেব ভাবতে বাধ্য হন, কোনো রকমের প্রকাশযোগ্য কবিতা বেশি না ছাপিয়ে , মাত্র দু চারটি কবিতা রেখে কবিতাকে প্রধানত কাব্য সমালোচনার পত্রিকায় পরিণত করার কথা। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে কবিতাপ্রেমিক বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন, যেভাবেই হোক কবিতার চূড়ান্ত জয় প্রতিষ্ঠা করতে। স্মরণ করা যেতে পারে 'কবিতা' -র দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৫৩) সম্পাদকীয় রচনায় তিনি লিখেছিলেন 'এখনও প্রয়োজন আছে এমন একটি পত্রিকার, কবিতা যেখানে পাদপূরণ নয় এমন কি অলঙ্করণও নয়, কবিতাই যার প্রধান উপকরণ ও আলোচ্য, কবিরা যেখানে একান্তরূপে স্বজাতির সঙ্গে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন, বিরূপ ও বিপরীত প্রতিযোগিতায় পীড়িত হবেন না। কাব্যকলা সম্বন্ধে আরো বেশী পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরচনায় উন্মুখ নবীনদের উৎসাহিত করতেও আমরা চাই, সেই জন্য অবিশ্রাম নতুন লেখকদের স্থান না দিলে কবিতার সার্থকতাই অনেকখানি নষ্ট হয়।'

'কবিতা'র প্রথম পর্বে যে কাজটি সবচেয়ে স্মরণীয়, তা হল গদ্য কবিতার বিবর্তন ও রূপান্তর নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষার মধ্য

দিয়ে তার একটা বড়ো অংশ 'কবিতা'কে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছিল। দু- পক্ষের তুমুল ছড়া-যুদ্ধের তাপ-উত্তাপ নিয়ে 'কবিতা' এক সময় মুখর হয়েছিল গদ্য-কবিতা বিতর্কে। 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধদেব আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ করেছিলেন, সেটি অনুবাদ - কবিতার চর্চা, একাজে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব নিজেই। বিশেষত তাঁর অনূদিত রিলকে, হোল্ডারলিন, ও বোদলেয়ারের কবিতা সমকালীন বাঙালি কবিদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। 'প্রগতি'-র মতো 'কবিতা'র একটি সমস্যা ছিল -- সেটি অর্থনৈতিক। অনেকবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করে তাকে প্রকাশ করে গেছেন কেবল মনের জোরেই। ত্রমিক অনুসারে, পঁচিশ বছরে একশ' চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যুগ্ম সংখ্যা মাত্র চারটি। এছাড়া বিশেষ সংখ্যা তেরোটির মধ্যে কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ। রবীন্দ্রসংখ্যা, নজল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিশেষ সংখ্যাগুলি অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। বিশেষ সংখ্যার তালিকায় তিনটি --- মার্কিন সংখ্যা (দ্বিভাষিক), বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংখ্যা, এবং শততম সংখ্যা বা আন্তর্জাতিক ইংরেজি - ভাষা সংখ্যাটি 'কবিতা'র সম্পাদকের বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছিল। একথা আজআমাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, 'আন্তর্জাতিক সংখ্যা' প্রকাশ করে তিনি চেয়েছিলেন ব্বি সভায় বাঙালি কবিদের একটা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে আবার 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল কালিদাস রচিত 'মেঘদূত' - এর বঙ্গানুবাদ, যা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার আর একটি দিক উন্মোচন করেছিল। স্বদেশের পাঠকদের কাছে কবিদের ব্যক্তিগত পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা ব্যবস্থা করেন।বিংশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা বিশেষত, কবি নন, কিন্তু সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতী মানুষদের স্মরণ করেছেন গভীর সমবেদনার সঙ্গে ---মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, কিংবা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হিমাংশুকুমার দত্ত বিষয়ে তঁার শ্রদ্ধা আমাদের এক আশর্চ্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আর একটা দিকও উল্লেখনীয়, শুধু সম্পাদক হিসাবে তিনি সতর্ক ও বিচক্ষণ ছিলেন তা নয়, মানুষ হিসাবেও তাঁর সহকর্মী কবিদের প্রতি মনোযোগী ও সহমর্মী ছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বাগচীর দীর্ঘদিনের মানসিক পীড়াজনিত অসুস্থতার জন্য 'শেষ রক্ষা' নাটক নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করে অভিনয়লব্ধ আটশত টাকা কবিবন্ধুর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারও কয়েকমাস পূর্বে গ্রাহক এবং পাঠকদের আনুকূল্য কামনা করে তিনি জানিয়েছিলেন, অন্নদাশঙ্কর রায়ের'রাতের অতিথি' কাব্য নাটিকাটির একটি বিশেষ সংস্করণ এই উপলক্ষে প্রকাশ করে বিত্রয়লব্ধ অর্থ 'কবিতা'র পক্ষ থেকে হেমচন্দ্রকে পাঠাবেন। কিংবা যখন তিনি যাদবপুরের শিক্ষক, তখন সদ্য মফস্সল্ আগত তণ ছাত্র কবিতার গ্রাহক কবি দিব্যেন্দু পালিতের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন ব্যাকুল হয়ে।

।। তিন ।।

প্রথমাবধি 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমে, আলোচনা ও উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন যে 'পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না।' কুড়ি বছর অতিত্রম করে, দীর্ঘ' সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন

'আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিল কবিতার পত্রিকা রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা রূপে। অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা, ---এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না সমসাময়িক সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম।' একই সম্পাদকীয়তে তিনি 'কবিতা'র বিশ বছরের পরিত্রমার সার্থকতার দিকটি তুলে ধরে উল্লেখ করেছিলেন 'আজকের দিনে যাঁরা পঞ্চাশ - প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁরা কুড়ির কিনারায় কম্পমান -- তাঁদের এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেরই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ অবারিত রেখেছি। আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি কয়েকজন তণ কবির যাথার্থ্য --- হয়তো তাঁরাও আক্ষরিকঅর্থে আর তণ নন, কিন্তু কনিষ্ঠরাও ইতিমধ্যে তাদের কাব্যচর্চার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রচার, মনে হয়, বিবর্ধমান; এই বিষয়টিতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-সত্যগর্ভিনীর অচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয় না। তার একটা বড় প্রমাণ এই যে গত দু-দিন বছরের মধ্যে তণ কবিদের অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পেরেছে, তার অনেকগুলো আবার একেবারে প্রথম বই।'

তিনজন প্রধান আধুনিক বাঙালি কবির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে 'কবিতা' পত্রিকার বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে তিনটি বিশেষ পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ট বর্ষের 'রবীন্দ্র সংখ্যা' পর্যন্ত কবিতার প্রথম পর্ব। সপ্তম বর্ষ থেকে ঊনবিংশ বর্ষ

‘জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা’’ পর্যন্ত ‘কবিতা’র মধ্য বা দ্বিতীয় পর্ব। বিংশ বর্ষ থেকে পঞ্চবিংশতি বর্ষ সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা পর্যন্ত কবিতার অন্তিম বা তৃতীয় পর্ব।

তিরিশের বছরগুলিতে যে সব কবি নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের বাহন ও প্রচারক রূপে ‘কবিতা’র যাত্রারম্ভ হয়েছিল। সেই মহাসূচনার পরবর্তী দীর্ঘ সময় অনেক বিতর্ক, বিচ্ছেদ, খ্যাতি ও উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ‘কবিতা’কে তিনি যথার্থই একটি সংগ্রামী সময়ের তীরে এনে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছেন আধুনিকতার উজ্জ্বল তীর্থে। রবীন্দ্রসংখ্যা’ থেকে ‘জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা’ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো - তেরো বছর, প্রধানত কবিতা বিষয়ক নানা তর্ক - বিতর্ক আলোচনায় ‘কবিতা’র জনপ্রিয়তাকে তিনি ত্বরান্বিত করেছেন। রবীন্দ্রসমালোচক তথা প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেবের ‘অপ্রমেয় অধ্যবসায়ে’র পরিচয়ে সমৃদ্ধ ওই পর্বের কবিতা। বলা যায়, বুদ্ধদেব তাঁর সময়সীমায় শুধু নিজের নয়, সমকালীন সমালোচকদের একটি যোগ্য বৃত্ত গড়ে তুলবার কাজে মনোযোগী হয়েছিলেন। ‘কবিতা’র কুড়ি বছর শু হওয়ার মুখে পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় রচনায় তিনি লিখেছিলেন ‘কোনো কবিতা - পত্রিকার পক্ষে আমরা বড়ো দীর্ঘকাল টিকে আছি, এ- কথা মানতেই হয়। হয়তো অসংগতরকম দীর্ঘকাল। পাঁচ, সাত, দশ বছরের উজ্জ্বল জীবনের পরে আমরা যদি অবসিত হতুম, সেইটাই যেন স্বাভাবিক হতো, সাহিত্যের উত্তম ঐতিহ্যের অনুগামী। ক্লান্তি নামেনি তা নয়, অন্ধকার প্রহর আমরা জেনেছি; কিন্তু সেই মুমূর্ষুতা অতিক্রম করার প্রেরণা কখনো হারিয়ে যায়নি, তা যে এই পত্রিকারই প্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিলো; তারই আদেশ পালন করে চলেছি আমরা।’

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, শেষ পর্বের ‘কবিতা’য় সমকালীন তণদের অগ্রাধিকার দিতে কিছুটা কুণ্ঠিত বোধ করতেন সম্পাদক, বলা যায় বাংলা কবিতার সাম্প্রতিকতম ধারাটির থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ‘কবিতা’। যদিও পঞ্চাশের দশকের তণদের মধ্যে অনেকেই ‘কবিতা’র নিয়মিত লেখক ছিলেন। ‘শতভিষা’ ও ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা অবলম্বন করে নতুন ধরনের বাংলা কবিতার যে দ্বিধা বিভক্ত পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে উঠেছিল, ‘কবিতা’র সূচিপত্রের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সেই তাপপ্রবাহ থেকে সযত্নে দূরে থাকতে চেয়েছেন সম্পাদক। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকায় (একবিংশ সংকলন ১৯৬৫) লিখেছিলেন ‘তণদের কবিতা সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কথা যখন প্রবলভাবে জানাতে থাকেন, তখন কখনও মনে হয়, তণদের মধ্যে তিনিই প্রধান তণ।’

তাঁর প্রয়াণের চৌদ্দ বছর পরে, কনিষ্ঠা কন্যা দয়য়ন্তী বসু সিং বুদ্ধদেবের কয়েকটি সংকলনের সময় ভূমিকায় লিখেছিলেন ‘বন্ধুরাই সদর্থে ‘আত্মীয়’ ছিল আমাদের পরিবারের, বুদ্ধদেব বসুর জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই। এই চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে পাঠক তা অনায়াসে দেখতে পাবেন। আমার স্মৃতি যাঁদের ঘিরে তাঁরা সকলেই বাবার বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। এখন পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি তাণ্যের আসন থেকে তিনি কখনো চ্যুত হননি। মৃত্যু তাঁকে চুরি করেছে কিন্তু বয়স তাঁকে ছুঁতে পারেনি।’ লক্ষ করার বিষয় বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বদা চিন্তিত বুদ্ধদেব জীবনের যা কিছু উত্তেজনা লাভ করেছিলেন কবিতারই সূত্রে। তিপ্পান্ন বছর বয়সে, যখন প্রায় স্থির করে ফেলেছেন ‘কবিতা’ আর প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তখনই প্রবাসে চ্যাপেল হিল্-এ বীট সম্প্রদায়ভুক্ত তণ ‘বীট’ সম্প্রদায়ের আড্ডায় নিজের তাণ্য ফিরে পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন জামাতা জ্যোতির্ময়কে ‘আমার অনেক বয়স হলো, অথচ আমার মুশকিল এই যে প্রবীণ পণ্ডিত অধ্যাপকীয় সংসর্গে আমাকে ঠিক ফেলা যায় না-- সাহিত্যিক ছেলে ছোকরাদের মহলে বরং আসর জমাতেপারি একটা জীর্ণ দেহের মধ্যে তপ্ত হৃদপিণ্ড অত্যন্ত অসংগতভাবে বহন করে বেড়াচ্ছি। তপ্ত? না -- হয়তো তাও মরে গেছে, হয়তো শুধু স্মৃতির তাড়নায় ছাইয়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে ফুলকি জ্বলে ওঠে -- যখন কবিতা পড়ি, কবিদের কথা পড়ি, বা যখন এমন কারো সঙ্গে দেখা হয় কবিতা যার শিরায় - শিরায় বইছে, সমালোচনার কেতাবে আবদ্ধ হয়ে নেই।’

‘কবিতা’ পত্রিকা হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন? -- এরকম একটি জরি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন ‘অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম ‘কবিতা’ বন্ধ করে দেব। কিন্তু বহু দিনের অভ্যাসের বন্ধন কাটাতে পারছিলাম না। তারপর কয়েক বছর আগে অনেকটা স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু-দুবার বিদেশ যেতে হল এবং সেই সময়েই ‘কবিতা’ এত অনিয়মিত হয়ে পড়ল যে, আমি ফিরে আসার পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। পারলাম না বললে ঠিক হয় না, ইচ্ছে করলে পারতাম। আসলে ইচ্ছেটাই মন থেকে সরেগিয়েছিল। তার কারণ কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে, বছরে চারটি সংখ্যা ভরাবার মতোই চলনসই রকমের ভালো কবিতাও সমালোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে আসল ক

ারণ বোধহয় এই যে, আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের জন্য, নিজের লেখার জন্য আরও বেশী সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এলে তা না করাই উচিত।'

সদ্য পাঠ সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র কলকাতায় এসেছিলেন তেইশ বছর বয়সে, 'কবিতা' পত্রিকা যখন প্রথমপ্রকাশিত হয় তখন বুদ্ধদেব সাতাশ বছরের যুবক, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাহান্ন বছর বয়সে এসে তিনি কবিদের 'খেয়ার নৌকো'-র হাল ছাড়লেন যা তিনি ইতিমধ্যেই পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন বিজনীনতার পরিচয়ের পারে।

'বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠপোষকের নয় -- প্রহর জাগা শান্ত্রীর' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কবিতা পত্রিকাতে পঁচিশ বছরের অবিরাম কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা, কেননা, 'যখন প্রগতি বেরিয়েছে, বলতে গেলে তখন থেকেই আধুনিকবাংলা সাহিত্যের সারথ্য তাঁর হাতে। তাই প্রতিপক্ষ সবচেয়ে বেশি শরবর্ষণ করেছে তাঁরই বিদ্ধে। সমকালীন লেখকদের মুক্ত কণ্ঠে স্বাগত জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুক দিয়ে আগলানো ---সাহিত্যে এভ াবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর কে করেছে?'

'কবিতা'র শেষ পাঁচ বছরে যে কজন উজ্জ্বল রচয়িতা যুক্ত হয়েছিলেন শক্তি তাঁদের অন্যতম, বুদ্ধদেবের নিবিড় সান্নিধ্য তিনি সন্তানদের মতো উপভোগ করেছেন, বুদ্ধদেবকে স্মরণ করে একটি শোকগাথায় তিনি লিখেছিলেন 'তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি, ছায়া পেতো, স্বচ্ছলতা পেতো।' 'যম' কবিতাটি, সামান্য সংশোধন করে ছাপার বিষয়ে অভিমত জানান, সেই পত্রপ্রাপ্তির বিষয়ে শক্তি জানিয়েছিলেন 'হাতে স্বর্গ পাই -- কিংবা, মনের মধ্যে কি এক অবাস্তব হ াওয়া বাড়তে থাকে।' সম্পাদক বুদ্ধদেব -এর নানা পরামর্শ - নন্দিত পত্রগুলি দেখলে, শিক্ষার্থী তণ কবিদের প্রতি তার শিক্ষকসুলভ আচরণে মুগ্ধ হতে হয়। শামসুর রহমান, অর্চন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এরকম চিঠিগুলি উত্তরকালের কবিদের কাছে সম্পদ বিশেষ মনে হবে।

''কবিতা' এবং 'কবিতাভবন' -- নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে একেবারে একাত্ম করে নিয়েছিলেন তিনি। কবিতাভবনের প্রবাদতুল্য আড্ডার প্রসঙ্গ তুলে একদা ফাদার রবার্ট আঁতোয়ান তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন 'তখন কবিতাভবন ছিল রাসবিহারী এভেন্যুতে। সেখানে অনেকবার গিয়েছি। সাহিত্য ও কবি বেষ্টিত হয়ে তিনি ধোঁয়ায় মেঘের মধ্যে বসে থাকতেন। প্রাচীন ভারতে যেমন শিষ্যেরা গু সেবা করত, ঠিক তেমন নয়। তিনি নানা মতের সংঘর্ষ ভালোব াসতেন, তর্কবিতর্কের মধ্যে বেশ মজা পেতেন এবং বিভিন্ন চিন্তাধারার আলোচনায় মেতে সারা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিতেন।' সেই কবিতাভবনের আড্ডায় শুধু মোহগ্রস্ত নয়---কিভাবে একজন কবির একমাত্র কবিতা লেখার মূল প্রেরণা হয়ে উঠেছিল সে বর্ণনাও পাওয়া যায় কবি অণকুমার সরকারের একটি রচনায় 'সেএকদিন ছিল। ঝাঁ ঝাঁ ঠিক দুপুরেই হোক বা নিঝুম রাত বারোটা, যে কোনো সময় দলবল নিয়ে কবিতাভবনে ঢুকে পড়া যেত। ঢুকলেই চা। গৃহকর্তা অবিশ্বাস্য রকমের চা খোর।... সেই ঘোর চা- খোর ব্যক্তিটি ছিলেন মূর্তিমানকবিতার আবহাওয়া। সাহিত্য ছাড়া অন্যকিছুতে তাঁর চি নেই। যা কিছু সাহিত্যসৃষ্টির বাধা স্বরূপ, তা সর্বৈব পরিত্যজ্য। তাই অধ্যাপনা ছেড়েছেন, ইতি দিয়েছেন সাংবাদিকত ায়। জনপ্রিয় লেখক নন, তবু লেখার উপরেই তাঁর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। সারাদিন, দিনের পর দিন, ঘরের মধ্যে কাটে। ক াজের মধ্যে দুই ---লেখা আর পড়া। জঙ্গী রাজনীতিকদের নাম পর্যন্ত জানেন না, বিষয়ী প্রৌঢ় বৃদ্ধদের দশহাত এড়িয়ে চলেন। আর তাঁর সঙ্গী যত বাউণ্ডুলে সাহিত্যপাগল ছেলে ছোকরা। তাদের সঙ্গে তাদের চেয়েও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। লাফিয়ে উঠে হাততালি দেন, ঘর ফাটিয়ে হাসেন।তার আলোচনার বিষয় শুধু সাহিত্য এবং সামান্য সজাগ থাকলে বোঝ া যায়, ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে আসা। বহির্বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জের তো নয়ই, কোন হালউঠতি চিন্তাধারাও নয়---কবিত া, একমাত্র কবিতাই তাঁর কবিতা লেখার উপকরণ, তিনি নিজেই তাঁর গল্প উপন্যাসের হাড়গোড়, মাসমজ্জা। স্বদেশী - বিদেশী পরিচিত - অপরিচিত কার রচনা ভালো লাগলে আর কথা নেই বুদ্ধদেব বসু প্রশংসায় ফেটে পড়েন। তাঁর মুখে কোনো দিন, শিথিলতম মুহূর্তেও কেউ পরনিন্দা শোনেনি।' নিজের কর্মজীবনে বুদ্ধদেব এবং কবিতাভবন কি সমাচ্ছন্ন প্রভ াব বিস্তার করেছিল, সে কথা বলতে গিয়ে অণকুমার আরো লিখেছেন 'ফলত কবিতা ভবনে দু-ঘন্টা আড্ডা দিয়ে আসা মানে হাওয়া বদল করে আসা, উদ্দীপ্ত হওয়া, কবিতা লেখার প্রেরণা পাওয়া। হায়রে, কালের নিয়মে একদিন সেই অ াড্ডাও ভেঙেগেল। আরও, সেই সঙ্গে বায়ুভূত হল আমার কবিতা লেখার প্রেরণা।' 'কবিতাভবন' - এর আড্ডা বিলুপ্তি প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত আশাভঙ্গেরকথা বলেছেন অণকুমার সরকার, কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কবিতা' পত্রিকার বিলুপ্তির কথা

তুলে, সাহিত্যজগতের, বিশেষত তণ সাহিত্যপ্রেমীদের, সামগ্রিক ক্ষতির দিকটি সখেদে বর্ণনা করে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় (ঘোড়শ সংকলন ১৩৬৯ চৈত্র) একটি অস্বাক্ষরিতঘোষণায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন 'শুধু মনে হয়, প্রথম লিখতে আরম্ভ করার সময় আমরা ভাবতুম যদি কখনো 'কবিতা' পত্রিকা পত্রিকায় আমার রচনা ওঠে, তবে জীবন ধন্য হবে। স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতুম 'কবিতা' পত্রিকার দিকে চেয়ে, মলাট ওলটাতে সাহস হত না, যদি সূচিপত্রে আমার নাম না দেখি। এখন যারা কবিতা লিখতে শু করবেন তাঁদের জন্য এ স্বর্গ রইল না। তাঁরা কোন কাগজে নিজের লেখা দেখে জীবন ধন্য করবেন? কোনো কাগজ নেই আর। স্বাধীনতার পর দেশের অনেক অনেক উন্নতি হচ্ছে তার প্রমাণ বড়ো বড়ো সেতু, হাজার হাজার স্কুল, গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এমনকি রবীন্দ্রনাথের নামেও কোটিখানেক টাকা ---এবং বাংলাদেশের কবিতা পত্রিকাগুলি একে একে উঠে যাচ্ছে।' দীর্ঘকাল পরে, হয়ত এরকম আক্ষেপের প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করা অযৌক্তিক কিনা এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশেষত বাংলাদেশে কাব্যপত্রিকার সংখ্যা গ্রাম ও শহর মিলিয়ে যখন সহস্রেরও অধিক। কিন্তু তঁার মতো সম্পাদক কি আমরা একজনকেও পেয়েছি? বিনয়মজুমদার 'কবিতা' পত্রিকায় কোনোদিন না লিখেও তাঁর বিষয়ে যথার্থ সত্য বলেছিলেন 'বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তণ কবিদের অভিভাবক। শুধু মুখে মুখে নয়, আলাপে আলোচনায় নয়, কাজেও। অভিভাবকোচিত কাজকর্মও তিনি করেছেন। আমরা --- 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর কবিরা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী'।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হতে চলল, 'কবিতা' পত্রিকার অবসান হয়েছে, এখনো পর্যন্ত কাব্যবিষয়ক পত্রিকার ক্ষেত্রে তাঁর সম্পাদনার মান অতিত্রম করার কোনো উদাহরণ আমাদের সামনে গড়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষায় আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে যে কোনো আলোচনায়, তাঁর নামোল্লেখ অবশ্য কর্তব্য, তাঁকে অস্বীকার করে, তাকে কোনোভাবে অনুদ্ধৃত রেখে যা কিছু আমরা করতে চাই না কেন, তা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর হয়ে উঠবে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর প্রায় একত্রিশ বছর অতিত্রান্ত। 'কবিতা'র মতো একটি নির্ভেজাল কবিতা - প্রধান পত্রিকা আর তাঁর মতো হৃদয়বান, জেদী, বন্ধুবৎসল, প্রজ্ঞাউজ্বল, সত্যিকার আধুনিক মনোভাবাপন্ন একজন নির্ভীকমনের নিপুণ সম্পাদক পেলে, হয়ত বহু প্রত্যাশিত আর একটা কাব্যযুগ সংগঠিত হতে পারত। বর্তমান একুশ শতাব্দীর সৃজনশীল সাহিত্যকে, বিশেষত নতুন ধরনের কবিতাকে সব দিক থেকে সকলের কাছে তুলে ধরার কাজে সেরকম একজন সম্পাদক নিশ্চয় অদূর ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন--- এই আশা অনেকেই পোষন করছেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com